তৃতীয় অধ্যায়
চারিত্রপূজা ও চিঠিপত্র

প্রথম পর্ব : চারিত্র পূজা

' যে সযত্নস্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ বারংবার উপস্থিত হয়। যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্য। মানুষ আপনি দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্য সতর্কতা পুণ্যকর্মের অঙ্গ। যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।'(১)

এই জাতি কোনো নির্দিষ্ট দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নয়, এই জাতি মানবজাতি। রবীন্দ্রনাথ এই মানবজাতির প্রতিনিধি হয়ে স্মরণ করেছেন সেই চিরস্মরণীয় মহামানবদের। চরিত্রপূজা নাম দিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমষ্টি কোনো বিশেষ সময়ে রচিত নয়। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জন্মতিথি অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বকে ঘিরে কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেখা। অধিকাংশ রচনাই ভাষণ রূপে কথিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চারিত্রপূজার চরিত্রগুলি হল বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহাত্মা গান্ধী।

' আমরা যাকে পরম মানব বলে স্বীকার করি তার জন্ম ঐতিহাসিক না আধ্যাত্মিক ।'(২) রবীন্দ্রনাথ যাঁদের কথা স্মরণ করেছেন তাঁদের সকলের বিষয়ে সর্বপ্রথম স্মরণীয় হল তারা সকলেই পরমমানব। বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচারক নন তাঁরা মানবধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। তাই তাঁদের শ্রদ্ধার দানে আমাদের অবনত শির।

১৯৩৫ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।''(৩) আবার ১৯১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়োদিন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।''(৪) একই ভাবে মহাত্মাগান্ধী , বিদ্যাসাগর কিংবা রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যে দিকটিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন তা হল মনুষ্যত্বের দিকটি। প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে এই মানুষ জীবন উৎসর্গ করে মানুষের কল্যাণে। মানুষের জন্যে মানুষের হয়ে তার লড়াই সত্যের পথে, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। মানুষের খুব কাছে থেকে তাঁর সুমহান মানবিক মহিমায় কখনো মাধুর্যে, কখনো বা ঐশ্বর্যে জয় করে মানবহৃদয়। তারপর বহুযুগ পর্যন্ত মহাপরাক্রমী বিপরীত শক্তি হয়তো বা স্থান পায় ইতিহাসের একটি কোণে অথচ সেই স্বল্প শক্তি আর অনেক মনুষ্যত্বের অধিকারী প্রতিপক্ষ সমগ্র দেশ ও জাতির ইতিহাস অধিকার করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ চারিত্রপূজা নামে প্রবন্ধটিতে (১৯০১) পূজ্য চরিত্র নির্বাচনের প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটি আবশ্যিক মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করেছেন। ''যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত্র সার্থক, যাঁহারা সমস্ত জীবনের

দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। . . . টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যতবড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।''(৫)

যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ভারতবর্ষের মনকে খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল তা আসলে ছিল মত্ততার উত্তেজনা। মহাত্মা যীশুর প্রতি আমাদের যে বিরূপ মনোভাব তার জন্য একলা আমাদেরই দায়ী করা যথাযথ বলে মনে হয় না। সাধারণ ভারতবাসীর কাছে যীশুর প্রাথমিক পরিচিতি ঘটেছিল এই মিশনারীদের হাতে। তারা ঈশ্বরের সন্তানকে জনগণমানসে একেবারে স্থূল খৃস্টানি সংস্কারের মোড়কে মুড়িয়ে তুলে ধরলেন। স্বভাবতই তাদের ধর্মমতের সাহায্যে আমাদের ধর্মসংস্কারকে পরাজিত করার একান্ত প্রচেষ্টা হয়ে দেখা দিল এই প্রয়াস। ফলে আত্মরক্ষার চেষ্টায় লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হলাম আমরা। ফলে গোড়াতেই যীশুখ্রীস্ট হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দেখা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই ভুলকে যথার্থই বিশ্লেষণ করেছেন— ' লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃস্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খ্রীস্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।'(৬)

ধীরে ধীরে সে ভুল ভেঙেছে এবং জ্যোতির্ময়ের সত্য দর্শন ঘটেছে আমাদের অন্তরে এবং সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি আমাদের সম্মুখে বাইরের সকল আবর্জনা ভেদ করে যিনি সর্বপ্রথম আমাদের এনে দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-পূজ্য অপর এক স্মরণীয় চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথ যিশুখ্রীস্টকে বলেছেন 'মানব সম্বন্ধের দেবতা'। এই প্রবন্ধে তিনি যীশুর ধর্মবাণীতে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন আর তাই বৈজ্ঞানিক যখন বলেন বহু তথ্যগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য তাদের সত্যে রূপান্তরিত করেছে তখন বস্তুরাজ্যের এই ঐক্যতত্ত্বকে অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখতে পাই— যিশুখ্রীস্ট বলেছেন— 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব। পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ।'

মানবসম্বন্ধের দেবতা

''এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে যে-

একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ একি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে। অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে। সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নীচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু আধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই।

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই। এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্‌, আমি যে একে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ— তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলেছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা। যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি 'হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্যে দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, ' আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যীশুখ্রীস্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।' পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খ্রীস্ট বলেছেন, 'আমাতে তিনি আছেন', প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা। এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরো অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খ্রীস্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই প্রকাশ। এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খ্রীস্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খ্রীস্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খ্রীস্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খ্রীস্টীয় সমাজে সাফল্য দেখিয়েছে— এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খ্রীস্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা

করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খ্রীস্টধর্মের বড়ো কথা। খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করেন— খ্রীস্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয় নি যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র; সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত ক'রে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরো মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আশ্রমবন্ধু অ্যানড্রুজের চিঠি পেলুম । তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল । বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়; তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিকদের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে। মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খ্রীস্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল। কে এতে রসসঞ্চার করে। এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খ্রীস্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইন্টারেস্ট অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব।' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয় মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খ্রীস্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সেই বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খ্রীস্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি। (৭)

২৫ শে বৈশাখ

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের চরিত চারিত্রপূজায় স্মরণীয় বলে গ্রহণ করেছেন লক্ষ্য করলে দেখব তাঁরা সকলেই মানব সমাজের সংকটের সময়ে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের অমিত দৃঢ় শাশ্বত প্রতিভার দ্বারা সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। এবং আরও আশ্চর্য বিষয় হল এই যে এঁরা কেউ-ই স্বসময়ে প্রতিপক্ষ বিরোধিতার কাঁটজাল থেকে রক্ষা পায় নি। একমাত্র মহাত্মা গান্ধী বিরোধিতা সত্ত্বেও যে কিছুটা সহযোগিতা পেয়েছিলেন সে কেবল যুগের আধুনিকতার খাতিরে। পূর্ববর্তীরা যে পথ গড়ে দিয়েছিল তারই প্রভাব মহাত্মা গান্ধীকে সাহায্য করেছিল আর তার সঙ্গে মিলেছিল রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বেরা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানবসমাজে বিশ্বাসের বিবর্তন। আজকের মতবাদ কাল পুরনো হয়ে গেছে। আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা রক্ষা করতে পারে নি। প্রতিদিন কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থান্ধ মানুষের হাতে তার ঔজ্জ্বল্য মলিন হয়েছে। তাই সমাজ ও ধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে এই পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে এঁদের। মানুষকে রক্ষা করার ব্রত নিয়ে রাজার ছেলে ঘর ছেড়েছে ধনীর সন্তান স্থাবর অস্থাবর সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে। অথচ এই অধ্যাবসায়ে তাঁরা থাকেন একক হয়ে হন নিন্দিত।

"রামমোহন রায়ও একদিন ঊষাকালে নির্বানদীপ তিমিরাচ্ছন্ন সমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি তোমরা জাগ্রত হও।

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু যাহা সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? "(৮)

রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলেবেলা থেকে রাজা রামমোহনের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন মহর্ষির থেকে শুনে। মহর্ষি তাঁর স্মৃতিকথায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে রামমোহন রায়ের মানসিক ও দৈহিক প্রতাপের উজ্জ্বল বিকিরণ পাঠক অনুভব করতে পারবে। সত্যের জন্যে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। আসলে নিজের জন্মক্ষণ ও জন্মস্থানের সীমার চেয়ে বহু বহু গুণ প্রসারিত ছিল তাঁর মনোভূমি। তাই এ'দুয়ের মধ্যে বিরোধ হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনিই প্রথম বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানের মূল বাংলা গদ্যভাষার পথ খননের দায়িত্ব কাঁধে নেন, সমাজে নারীর অধিকার

সমর্থনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারীর অধিকার সকল দিক থেকেই ছিল সংকুচিত। আবার যখন স্বজাতির সম্মান দাবি করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তখনও দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নি। ফলে জাতি ও সমাজ কেউই সেদিন তেমন করে বুঝতে পারে নি রাজা রামমোহন রায়ের মর্ম। তবু হাল ছাড়েন নি আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অবিরত।

১৮২৯-এ যদিও বা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সতীদাহ খাতায় কলমে রদ হল কিন্তু কার্যকরী হল না। ১৮৩৩ সালে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হল সুদূর বিস্টল শহরে। এবার সেই অনর্পিত দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন মেদিনীপুরের যোদ্ধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে পথ রামমোহন রায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন সেই পথ ধরে সেই দায়িত্ব সকল পাথেয় করে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত রাখলেন তিনি। শুরু হল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার আর প্রচলিত হল বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৃদ্ধিও প্রসার। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান বলেই তিনি অসংকোচে সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন কলেজে শূদ্রদের বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন। এরূপ একাধিক কার্যের দ্বারা বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশ ও বঙ্গজদের সত্যের পথ দেখিয়ে গেছেন তাঁর হৃদয় ছিল দয়ায় পূর্ণ। তিনি মানুষের দুঃখ দেখতে পারতেন না। কিন্তু এই দয়ালু বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কোথাও হৃদয়দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ ও পৌরুষোচিত এইজন্যে তা সরল ও নির্বিকার। তিনি মানুষের দুঃখ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল নিষ্ফল সান্ত্বনা দান করেন না তিনি বুক পেতে তার দুঃখের ভার যথাসম্ভব বহন করেন ও অন্যায়ের শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করে যান এইখানেই তাঁর দয়ার মহত্ত্ব। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ; তাহার মধ্যে কোনো নতুনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহ গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে—

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! · · · অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেস উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমার প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার-রিপু-বশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছে; কিন্তু, কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয়

না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ।'

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মার্চমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সে'ই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারের বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া ওঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না। আমরা সে স্থলে সুনিপুন কাব্যকলা-প্রয়োগপূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সবল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সরলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষনাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া, আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধন্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কি মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা, উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূমণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মান রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা 'জননীদেবী চরখায় সূতা কাটিয়া উভয় পুত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।' সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমন্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে

সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনেন্ট গবর্নর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মানলাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশে তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না, বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবনমিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়, মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশবিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্‌স, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্‌কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশ শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন, কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎচরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া

আমাদের তুচ্ছতা , ক্ষুদ্রতা, নিস্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি— এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।' (৯)

এই সকল মহাপুরুষেরা আজীবন অক্লান্ত প্রয়াস করে গেছেন মানুষের মধ্যে মিলনের পথ সৃষ্টির। কেবল মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নয় তাঁদের মতে মনুষ্যত্বের বিচ্ছন্নতাই প্রধান সমস্যা। ধর্ম সমাজ এই রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই এই সমস্যা প্রকট। অথচ মানুষের সৃষ্ট সমাজের গোড়ার কথাই ছিল দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস। " মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন।"(১০) সাধকেরাও বিশ্বমৈত্রীর প্রচার করেছিলেন। বিশ্বমৈত্রীর মাধ্যমে আমাদের অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তিদানের প্রয়াস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে দু'জনে মানবধর্মের সাধকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাত্মাজী অন্যজন ঋষি অরবিন্দ।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠা কবিকে অভিভূত করেছিল কিন্তু তাঁর যে গুণ রবীন্দ্রনাথকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা হল— "আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসাপ্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা জানি কি। মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। ··· অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।"(১১) রাষ্ট্র ব্যাপারে যে অহিংসনীতিকে তিনি প্রচার করে এসেছেন সেই নীতিকে তিনি প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতেও দ্বিধা করেন নি— এখানেই তাঁর মহত্ত্ব তাই তিনি মহাত্মা।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে তিনি সমভাবনায় উদ্দীপিত করেছিলেন। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ জাতীয় নেতৃত্বের অভাবে সর্বভারতীয় রূপলাভ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও

দুর্বলতায় অনুভূত ভারতবাসীর হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলে প্রমুখ নেতৃত্বেরা। এঁদেরই অসমাপ্ত অভিপ্রায়কে অতি দ্রুত ও সুনিপুনভাবে যিনি সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চললেন তিনি গান্ধীজী। একসূত্রে বেঁধে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার লক্ষে পা বাড়ালেন আর নির্ভিক চিত্তে সেই আন্দোলনের প্রথম সারিতে দাঁড়ালেন তিনি নিজে।

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাগান্ধীর আদর্শ ও কর্মের প্রতি আজীবন গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে গান্ধীর কয়েকটি রাজনৈতিক চাল রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। কালান্তরের প্রবন্ধে তার উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অনশন ব্রত উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে, চিঠিটি ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ সালে লেখা।

" মহাত্মাজী মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্যে এই কৃচ্ছ্রসাধন (অনশন) করতেন তাহলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত। . . . মহাত্মাজী যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশন ব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারছি নে,— বরঞ্চ ফল উল্টো হবারই কথা। এই রকম একটা উদ্‌বেগের মুখে আমি যে একটা অকর্তব্য করেছিলুম, আজ পর্যন্ত তার অনুতাপ বহন করছি। তিনি তখন মৃত্যুর অত্যন্ত কাছে পৌঁছেছিলেন। আমি ছিলুম জেলখানায় তাঁর নিকটেই। আমাদের একান্ত লক্ষ্য ছিল তাঁকে বাঁচানোর , বিচার করবার লেশমাত্র সময় ছিল না। সেই হতবুদ্ধিতার মুহূর্তে রাষ্ট্রিক নির্বাচন সম্বন্ধে অন্যায় সমর্থন জানিয়ে র‍্যামেজে ম্যাকডোনাল্ডকে যে তার করেছিলুম তার আঘাত বাংলা দেশের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে রইল। লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনো দিন একে কর্তব্য বলে স্বীকার করে নি। · · · গান্ধীজীর এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষী আবদার দেশে ছড়িয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মহাত্মাজী বলেন এই রীতি একমাত্র তাঁরই অনুষ্ঠেয়। এরকম আধ্যাত্মিককে শ্রদ্ধা করব কী করে।"(১২) প্রথমত র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে লেখা চিঠিকে 'অন্যায় সমর্থন ' বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়ত লক্ষ সিদ্ধির জন্য যেন তেন কৌশল অবলম্বন করা। তৃতীয়ত, অনশনকে 'আত্মপীড়নমূলক অন্যায় আবদার' নাম দেওয়া রবীন্দ্রনাথের গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার অনেকখানি অপহরণ করে নিয়েছে। আবার কালান্তরের 'চরকা' প্রবন্ধটি —" কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না(যদিও লোকভয় যথেষ্ঠ আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার অন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায়নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন।" (১৩)— পূর্ববর্তী বক্তব্যেরই আরও দৃঢ় সমর্থন দাবি করছে।

" একদিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দু রাজত্বের ছোটো ছোটো আসগা পাটকেলের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি। রাজার সঙ্গে আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশের মাটিতেই। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক আবর্জনা নয়,

একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ঠ সুতো নেই, কারণ এই যে আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।"(১৪)

যথার্থ পথে অগ্রসর না হয়ে মিথ্যেকে আশ্রয় করে জনগনের মনে অকারণ উন্মাদনা প্রচারের একান্ত বিপক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশজোড়া দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্যলক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের দ্বারা একটি বাহ্য আচরণ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া গান্ধীজীর মতো নেতার পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ভারতবর্ষের পক্ষে তা আশঙ্কাজনক।

অন্য আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর ব্যবহারে মর্মাহত হন তা হল ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বোসের প্রতি গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের আচরণ। তিনি এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন।

যদিও চারিত্রপূজার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বিরোধ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ জীবনে কোনোদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি অন্তত না করার আত্যন্তিক প্রয়াস করেছেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্র আলাদা, একেবারেই আলাদা। তবু স্বক্ষেত্রে যেখানে তাঁর মহত্ব রবীন্দ্রনাথ সেই পরিধিকে যেমন যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন আবার তেমনি করেই ব্যক্তি গান্ধীর যেখানে সীমা সেখানে তাঁর সীমিত প্রকাশকে অশ্রদ্ধা না করে সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হন নি।

ঐক্য ও মানবধর্ম ছিল রবীন্দ্রনাথের আজীবন ব্রত। তাই তিনি নিজে এদের সকলের হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন—

দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এইসব মহামানবেরা তাঁদের দেবোপম চরিত্র নিয়ে মানুষকে মহান করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব : চিঠিপত্র

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩০-৪১) রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ পত্র বা পত্রগুচ্ছই কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশ করে রচিত। উদাহরণ হিসাবে রাশিয়ার চিঠি কিংবা ছন্দ ও ভাষা বিষয়ে লেখা অজস্র পত্রের উল্লেখ করা যায়। তাই ঐ সকল পত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা কালে উল্লিখিত হবে। কিন্তু পারস্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত চিঠিগুলি ঠিক ভ্রমণ বর্ণনা মাত্র নয় একথা যেমন সত্য তেমনি আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে সামগ্রিক পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপস্থাপনার প্রয়াস এতে রবীন্দ্রনাথ করেন নি। একই ভাবে 'পথে ও পথের প্রান্তে' নাম নিয়ে যে চিঠিগুলি লেখা হয় সেগুলি ১৯২৬ সালে দীর্ঘ কালব্যাপী ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পথযাত্রার ছিন্নসূত্রকে মালায় গাঁথার উদ্দেশ্যে। 'পারস্যে' (১৯৩৬) ও 'পথে ও পথের প্রান্তে'(১৯৩৮)

গ্রন্থদুটিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বললেও আপত্তি ওঠার আশঙ্কা নেই তবুও বিতর্কের আবর্তে না পড়ার জন্যেই সোজা কথায় একে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের 'চিঠিপত্র' পর্বের অধীনেই রেখে দিলাম।

১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ পারস্য যাত্রা এবং ইরান ও ইরাক ভ্রমণ বৃত্তান্ত পারস্য যাত্রা এবং পারস্য ভ্রমণ নামে যথাক্রমে প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই ভ্রমনবৃত্তান্ত ১৯৩৬ সালে সংক্ষিপ্ত আকারে জাপানে-পারস্যে গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ অর্থাৎ জাপান অংশ ১৯১৯ সালে জাপান যাত্রী নামে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় জাপানে পারস্যে গ্রন্থের জাপান ভ্রমণ অংশ আলোচ্য সময়সীমার বাইরে বলে বাদ দেওয়া হল।

পারস্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল অতি অল্প বয়সেই কবি হাফেজের মাধ্যমে। পিতৃদেব মহর্ষি ছিলেন হাফেজের একনিষ্ঠ ভক্ত। এবং দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের একাধিক কবিতার অনুবাদও করেছিলেন। পারস্য ভ্রমন বৃত্তান্তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ' অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। পিতার তীর্থস্থানে আমার মানসঅর্ঘ্য নিবেদন করতে।'(১৫) ধর্মের যে ভেদ এশিয়া মহাদেশের দুটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল তাকে মিলনের পথ দেখালেন ভারতের কবি। এতবড় দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যে দানা বেঁধেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ঘিরে, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পারস্য ভ্রমণের স্মৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। বোগদাদ ম্যুনিসিপ্যালিটি কর্তৃক কবি সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শ জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানালেন— "আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংসা , ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জরিত , স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আজ আপনাদের কবিদের আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তি লাভের পথ।"(১৬)

অন্যদিকে ব্যোগদাদে সাহিত্যিকদের আয়োজিত চায়ের নিমন্ত্রণ সভায় রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য পেশ করলেন সবশেষে—" আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরবের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে, ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আরবসাগর পার করে আরবের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান— যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে। আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্য নামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে

মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।'' (১৭) রবীন্দ্রনাথ ইসলাম ধর্মের আদর্শের জয়গান গেয়ে ভারতবর্ষের ধর্মভ্রষ্ট মুসলমানদের পথ দেখানোর জন্য অনুরোধ করলেন সমগ্র পারস্যবাসীকে। হজরত মহম্মদের বাণী অন্যান্য সকল ধর্মের মানুষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার কথাই বলেছে অথচ আজ ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু নাম ধরে রাষ্ট্রের ঐক্যকে যদি ক্ষুন্ন করতে উদ্যত হয় তাতে মঙ্গল কারো হবে না। অন্তত তাদের ধর্ম সেকথা বলে না।

পারস্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ বর্ণনার সূত্রে পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও অনায়াস ভঙ্গিতে আধুনিক পারস্যের ইতিহাসের একটুখানি আভাস দিলেন। ইংল্যন্ড ও রাশিয়ার অত্যাচারে নিরন্তর নিপীড়িত পারস্য কিভাবে রেজা খাঁর নেতৃত্বে আপন স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব ফিরে পেল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এত স্বচ্ছন্দ ইতিহাস যে ইতিহাসের ভারে পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত এতটুকুও ব্যাহত হয় নি।

'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্রগুচ্ছের রচনা শুরু ১৯২৬ সালের শেষের দিকে এবং শেষ হয়েছে ১৯৩৯ সালে। আমাদের আলোচ্য সীমার মধ্যে একেবারে শেষের দিকের দশ বারোটি চিঠি রয়েছে এবং সাধারণ ভ্রমন বৃত্তান্ত ব্যতীত বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় এতে নেই বললেই চলে। কিন্তু এই পত্রধারার প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে এখানে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁর ফুরিয়ে যাবার প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি সরাসরি জানিয়েছেন এই পর্ব তাঁর জীবনের পরিশিষ্ট পর্ব। '' মানসিক জীবনে যে স্রোতবেগে চলার সঙ্গে সঙ্গে বলা আপনি মুখরিত হয়ে ওঠে একদিন তাঁর একটা অবসন্নতা বা অবসান ঘটে। ··· আজ কাছে এসেছে আমার সেই ধ্বনিহীনতার বয়স।''(১৮) আবার অন্য একটি চিঠিতে লিখছেন— '' আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে, কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ ফসকে যায়। যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদসাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছলে উঠতে বাধা পায়— তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে বোধ হয় এই জন্যেই লেখবার দুঃখ স্বীকার করতে মন রাজী হয় না।''(১৯)

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে যখন বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায়ে জাহাজে চড়েন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে আসা আহ্বানের আমন্ত্রণ রক্ষা করা । কিন্তু যাত্রাপথে জাহাজে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই রোগশয্যায় তিনি প্রথম মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগল এবং পেরু যাওয়াও তাঁর বাতিল করতে হল। আর্জেন্টিনায় থেকে গেলেন বেশ কিছু দিন সঙ্গী হল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই যে জীবনের গতি ফের এই উপলব্ধি কবিকে আতঙ্কিত করে তুলল। ফলে একটা ফুরিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়ার বোধ তাঁকে বার বার আঘাত করতে থাকে। 'পরিশেষ' কাব্য গ্রন্থের নাম করণের মধ্যেও এই ভাবনাই ক্রিয়া করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে দেখা গেল এই মৃত্যুর ভাবনাই কবিকে একেবারে বদলে দিল। তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে চোখ মেললেন পৃথিবীর দিকে। 'সময় যে আর নাহিরে' তাই আর দেরি নয় মানুষের জন্য মানুষের হয়ে অস্তিত্বের নানা বিভাগেই তাঁর জবাবদিহির গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। পথে ও পথের প্রান্তরে টুকরো চিঠিগুলো সেই গুরুদায়িত্বের আভাস দিয়ে যায়।

উৎস-নির্দেশিকা

১। বিদ্যাসাগর স্মৃতি / চারিত্রপূজা, রবীন্দ্ররচনাবলী - একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৮৯। পৃ: ২১৬।

২। বড়োদিন/ চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ২৬৮।

৩। বুদ্ধদেব/ চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ২৫৫।

৪। যিশুচরিত/ চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ২৬৩।

৫। চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ১৭১।

৬। খৃস্ট চারিত্রপূজা ১৯১০, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৪ খণ্ড, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ: ৭।

৭। মানব সম্বন্ধের দেবতা। চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭।

৮। রামমোহন রায় / চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ২২২।

৯। বিদ্যাসাগর চারিত/ চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ১৮৪।

১০। ভারতপথিক রামমোহন / চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত - ১৮৮৯

১১। মহাত্মা গান্ধী/ চারিত্রপূজা, ঐ, পৃ: ২৭৩।

১২। প্রবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী - বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য/ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, পৃ: ১৯৫।

১৩ চরকা/ কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী- ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৯০ পৃ: ৬৯১।

১৪। ঐ, পৃ: ৬৯২।

১৫। জাপানে ও পারস্যে (৪) রবীন্দ্র রচনাবলী - দ্বাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৮৯ । পৃ: ৪৫৮।

১৬। জাপানে ও পারস্যে (৭) ঐ, পৃ: ৪৭৩।

১৭। জাপানে ও পারস্যে (১০) ঐ, পৃ: ৪৮১।

১৮। পথে ও পথের প্রান্তে/ ভূমিকা, ঐ, পৃ: ৪৯০।

১৯। পথে ও পথের প্রান্তে / পত্র সংখ্যা-১০, ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯৮।